

শিবাজী মহারাজ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

মূল্য বারো আনা

প্রিণ্টার—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ, ৬ই জানুয়ারী

পরিচয়

শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, সি-আই-ই

সব জাতির মধ্যে এক-একজন বীর জন্মেন, যাঁহার নাম সকলেই পূজা করে, যাঁহার কথা শত শত বৎসর ধরিয়া ছেলে-বুড়ো শুনিতে চায়।

আমাদের এই মহাদেশের দক্ষিণ দিকে মহারাষ্ট্র প্রদেশে শিবাজী এইরূপ একজন। তিনি আড়াই-শো বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার নাম করিলে মহারাষ্ট্র দেশে যেন নূতন প্রাণ আসে।

তাঁহার সঙ্গীরা তরবারি লইয়াই ব্যস্ত ছিল বলিয়া তাঁহার জীবনের কথা বেশী কিছু লিখিয়া যায় নাই। যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে, তাহা আমার ইংরেজী পুস্তকে দিয়াছি।

এই বীর ও পুণ্যাত্মা শিবাজীর জীবনের চারটি মনোরম ঘটনা লইয়া ছেলেদের জন্য অতি সুললিত ভাষায় ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার এই বইখানি লিখিয়াছেন।

ইহাতে যথাসম্ভব ইতিহাসের সত্য রক্ষা করা হইয়াছে। গল্পগুলি সত্য হইলেও উপন্যাসের মত আশ্চর্য্য। আর ইহাতে শিবাজীর চরিত্র অতি সুন্দর পরিষ্কার-ভাবে দেখা যায়।

সুখ-দুঃখের দোসর

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন

প্রিয়বরেষু

গ্রন্থকারের আর দুইখানি ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা

মজাদার গল্পের বই

রণ-ডঙ্কা	...	...	বারো আনা
কেল্লা-ফতে	...	...	আট আনা

শিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন কর্ত্তৃক চিত্রিত



শিবাজী মহারাজ

(প্রাচীন চিত্র হইতে)



বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল

শিবাজীর বাপ শাহ্‌জী চাকরি করিতেন বিজাপুরের রাজসরকারে। শিবাজী থাকিতেন পুণা গ্রামে মা জীজাবাঈ-এর কাছে। ভারি দুর্দ্দান্ত ছটফটে ছেলে, তার উপর বুদ্ধি

অতি তুখড়; দল পাকাইয়া সর্দ্দারি করিতে তাঁর জোড়া মেলা ভার। সুবোধ ছেলের মতো লেখাপড়ায় মন দিয়া পণ্ডিত হইবার দিকে তাঁর মন গেল না—ছুটোপাটি মারামারিতে পাকা হইয়া উঠিলেন। লুটপাট দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইল তাঁর খেলাধূলার সামিল। এমনি করিয়া যখন বয়স আর সাহস দু-ই বাড়িয়া উঠিল, তখন আর সামান্য লুটতরাজে ঝোঁক রহিল না,—লড়াই করিয়া কেল্লা ফতে করিবার জন্য মাতিয়া উঠিলেন। আজ করেন এ-কেল্লা দখল, কাল করেন ও-কেল্লা ফতে, পরশু করেন অমুক লড়াইওয়ালার সঙ্গে লড়াই। ক্রমে শিবাজীর সাহস এতটা বাড়িয়া উঠিল যে, তাঁহার পিতা শাহজী যে বিজাপুর-সরকারে কাজ করিতেন, সেই রাজ্যেও দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আদিল শা তখন নামেমাত্র বিজাপুরের রাজা; আসলে কিন্তু বুড়ো রাণী বড়ী-সাহেবাই রাজ-কার্য্য চালাইতেন। তাঁর যেমন বুদ্ধি, তেমনি

সাহস। তিনি শিবাজীর এই উৎপাত সহ্য করিবেন কেন? বিজাপুর এক সময়ে একটা রাজ্যের মতোই রাজ্য ছিল। ধন-বল বলো, জন-বল বলো, কিছুই তাহার অল্প ছিল না। লড়াইয়ে বিজাপুরের রাজারা কোনকালেই পেছ-পাও নয়। মোগল-বাদশাদের সঙ্গে তো বিবাদ একরূপ লাগিয়াই আছে; তবু বিবাদ—বিবাদই সই, হার মানিতে রাজি নয়। কিন্তু এখন অবস্থা খারাপ। অনেকদিন রাজত্ব করিলে রাজবংশের লোকদের যে-সব দোষ ঘটে, তাহাদেরও তাহাই হইয়াছে। সবাই বিলাসী বাবু হইয়াছেন, আর ঘরোয়া বিবাদে ব্যস্ত আছেন। তারপর একদিকে মোগল-বাদশা, আর একদিকে মারাঠাদের রাজা শিবাজী,—বাঘ আর ভালুকের মতো, দুইদিকে ওৎ পাতিয়া বসিয়া; শুধু বসিয়া নয়,—থাকিয়া থাকিয়া হানা দিতেও কসুর করিতেছেন না। লোকে বলে,—মরা হাতী লাখ টাকা, তা বড় মিথ্যা নয়। বিজাপুরের বুড়ো রাণী শিবাজীর

অত্যাচার চুপ করিয়া বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। শাহজীকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি আমাদের খাইয়া-পরিয়া মানুষ, আর তোমারই ছেলে আমাদের ওপর অত্যাচার করিবে, এ কেমন কথা ? বিহিত করো, ছেলেকে সায়েস্তা করিয়া দাও।

শাহজী ফাঁপরে পড়িলেন। ছেলের উপর তাঁহার কোন জোরই ছিল না; বুড়া বয়সে আবার বিবাহ করিয়া তিনি শিবাজী ও তাঁর মা জীজাবাঈ-এর কোনো খোঁজখবর রাখিতেন না। মুখ কাঁচুমাঁচু করিয়া বলিলেন,—আমাকে দোষ দেওয়া বৃথা। ভারি বেয়াড়া ছেলে শিবা, সে আমার কোনই তোয়াক্কা রাখে না; আমি তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিব না। আপনি যেমন করিয়া পারেন তাকে শাস্তি দিন, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

বড়ী-সাহেবা তখন চটিয়া বলিলেন,—বেশ, তবে তাই হবে। শেষকালে কিন্তু দোষ দিতে

পারিবে না, তা বলিয়া রাখিলাম। দেখো, আমি তার কি দশা করি! কে আছ আমার সেনা-সামন্তের মধ্যে এমন লোক, যে শিবাজীকে উচিত-মতো সাজা দেয়?—এই বলিয়া রাজসভার মাঝে তিনি একটা পানের খিলি রাখিয়া দিলেন। তখনকার দিনে যুদ্ধের জন্য এই রকম পান রাখিয়া সেনাপতি ঠিক করা হইত। খিলি দেওয়ার পর যে-বীর সকলকার আগে গিয়া টপ্ করিয়া পানটি তুলিয়া লইতেন, তাঁহাকেই সেনাপতি করিয়া যুদ্ধে পাঠানো হইত।

একটা লম্বা-চওড়া লোক তখনই ছুটিয়া আসিয়া রাণীর রাখা সেই পানের খিলিটা তুলিয়া লইল; নাম তার আফজল খাঁ, ভারি লড়াইওয়ালা সে।

কিন্তু শিবাজীও লোক বড় সহজ নয়। তার অনেক সৈন্য। আবার যে মারাঠা-দেশে তার বাড়ী, সেখানে মাথা গলানো বড় শক্ত;—পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতের ঘোর বন-জঙ্গল যেন দেশটাকে বুকে করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

ইহাকে ভেদ করিতে হইবে। তারপর মারাঠাদের মাব্‌লে-সৈন্যেরা যমদূতের দোসর। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হয়। এই-সব জানিয়া-শুনিয়াও আফজল এতটুকু দমিলেন না, বুক ফুলাইয়া বলিলেন,—হুঁ, ভারি তো কাজ! তার মতো অমন লোক আমার ঢের ঢের দেখা আছে। তার সঙ্গে আবার লড়াই কিসের? যাব, আর চুলের মুঠি ধরিয়া তাকে বাঁধিয়া লইয়া আসিব, আমাকে ঘোড়া হইতে নামিতেও হইবে না।

আফজল যতই বড়াই করুন না কেন, রাণী তাহাতে ভুলিলেন না। তিনি নিজের অবস্থাও বোঝেন, আর শিবাজীকেও জানেন। মোগল-বাদশাদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাঁর অনেক সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে, আর সৈন্য ক্ষয় করিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই; বলিলেন,—সামনা-সামনি যুদ্ধ না হইলেই ভাল। কলে-কৌশলে কাজ হাসিল করিতে হইবে। মুখে ভাব দেখাইয়া

শিবাজীকে ভুলাইবে; বলিবে যে, কোনো ভয় নাই, বিজাপুর-রাজ আদিল শা তাহার দোষ লইবেন না। এস আমরা মিটমাটের একটা ব্যবস্থা করি। এইরূপে হাত করিয়া, হয় তাকে খুন, নয় কয়েদ করিয়া ঘরে ফিরিবে।

আফজল 'বহুৎ আচ্ছা' বলিয়া সেলাম ঠুকিয়া মস্ত একটা হাতীতে চড়িলেন। দশ হাজার ঘোড়সওয়ার সঙ্গে চলিল।

তুল্‌জাপুর মারাঠাদের সব-চেয়ে বড় তীর্থ —এইখানে তাহাদের ভবানী-মন্দির। আফজল সদলবলে এইখানে চড়াও হইয়া মন্দির ভাঙ্গিলেন, আর পাথরে-গড়া ভবানী দেবীকে যাঁতায় পিষিয়া ছাতু করিলেন। মারাঠারা রাগে গর্‌গর্ করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। আফজল ভারি যোদ্ধা, ভারি দুরন্ত, আর ভারি ধূর্ত্ত,—তার কাজে বাধা দেয়, এত বড় বুকের পাটা কার?

কিন্তু আফজলের মনেও কি ভয় নাই? যে মারাঠা-সর্দ্দার এক দেশ হইতে আর এক দেশে

আসিয়া কেল্লা দখল করে, তলোয়ারের ঘায় বড় বড় বীরের মাথা উড়াইয়া দেয়, সে যে দেশের মধ্যে তুশমন পাইলে এক হাত না লইয়া ছাড়িবে, ইহাও কি সম্ভব? কিন্তু আফজল যখন দেখিলেন যে, ভবানী-মন্দির গুঁড়া হইলেও মারাঠারা উচ্চবাচ্য করিল না, তখন তাঁহার সাহস খুব বাড়িয়া গেল; ভাবিলেন, ব্যাটারা নিশ্চয় ভয় খাইয়াছে!

আফজল এইবার ঠিক করিলেন, বাজের মতো হঠাৎ শিবাজীর আবাস—পুণার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবেন; কিন্তু শুনিলেন, সেখান হইতে শিবাজী দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতাপগড়ে গিয়াছেন। তখন তাঁহাকেও সেইদিকে ছুটিতে হইল; পথে যত ঠাকুর-দেবতার মন্দির চোখে পড়িল, সব ভাঙ্গিয়া চূরমার করিলেন, বামুন-পণ্ডিতের টিকি কাটিলেন। তারপর সাতারার দশ ক্রোশ উত্তরে বাই শহরে গিয়া ছাউনী করিলেন।

শিবাজীর সৈন্যেরা ইহার আগে জায়গায় জায়গায় লুটতরাজ করিয়াছে—ছোটখাট লড়াই, এমন কি দু'চারটা কেল্লাও যে দখল না করিয়াছে, তা নয়। কিন্তু এবার বড় ঠেকাঠেকি ; তাদের সঙ্গে লড়িতে আসিতেছে—বিজাপুরের পাক্কা লড়াইওয়ালা সেনাপতি আফজল খাঁ ; সঙ্গে তাঁর দশ হাজার ঘোড়সওয়ার, গরুর গাড়ীতে বড় বড় কামান, ঘোড়ার পিঠে বারুদ, লড়াইয়ের আরও কত কি সরঞ্জাম। আফজল বিজাপুর হইতে বাই—সারা পথটাই লুটপাট করিতে করিতে আসিয়াছেন। শিবাজীর মারাঠা-সেনারা একটু ঘাবড়াইয়া গেল ; এমন তালিম্ সৈন্যের গোলা-বারুদের মুখে দাঁড়াইয়া লড়াই করা কি সহজ কথা ? তাহারা শিবাজীকে বলিল,—প্রভু, যুদ্ধে কাজ নাই—রফা করুন। যুদ্ধ করিলে খালি প্রাণই যাইবে, আর কোনো ফল হইবে না।

শিবাজী এক মহাভাবনায় পড়িলেন। মিটমাট তো ইচ্ছা করিলেই করা যায়। কিন্তু তার ফল কি?—লড়াইও করিতে হইবে না, কাজেই লোকজন খুনজখম হইবে না। কিন্তু যে নামের জন্য, বড় হইবার জন্য, এতদিন ধরিয়া এত চেষ্টাযত্ন, এত রক্তারক্তি কাটাকাটি করিলাম, তা সবই বৃথা হইবে!—শিবাজীকে বিজাপুরের গোলাম হইয়া থাকিতে হইবে! আর মিটমাট না করিলে দুশমন বিজাপুরের সঙ্গে কতদিন ধরিয়া এই লড়াই চলিবে, কে বলিতে পারে? কিন্তু শিবাজী যে স্বাধীন, সেই স্বাধীনই থাকিবে,—কেউ তাকে গোলাম বলিয়া, অধীন বলিয়া, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে পারিবে না।

সারারাত শুইয়া শুইয়া শিবাজী ভাবিতে লাগিলেন, কোনটা বাছিয়া লইব—গোলামী, না লড়াই? না—না গোলামী নয় কিছুতেই—যুদ্ধ! পরদিন সকাল-বেলা লোকজনদের ডাকিয়া বলিলেন,—ভাই-সব, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও;

ভাবিয়া দেখিলাম, কারও কাছে খাটো হইতে পারিব না। মরি যদি সেও ভাল, তবু খাটো হইতে পারিব না। বীরের কাছে মৃত্যু তো খেলা—তার জন্যে ভয় কি। এস আমরা বীরের মতো যুদ্ধ করিয়া মরি।

দলপতির কথায় মারাঠাদের গায়ের রক্ত যেন টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল, তারা সিংহের মতো গর্জ্জিয়া উঠিল,—জয় মা ভবানী!—সে গর্জ্জনে পাহাড়-বন কাঁপিয়া উঠিল।

এদিকে আফজল যখন দেখিলেন যে, শিবাজীর নাগাল পাওয়া যাইতেছে না—পাশ কাটিয়া এখান হইতে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন ঘোষণা করিলেন, যে-লোক শিবাজীকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাকে অনেক টাকা বখশিশ দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না। তখন আফজল আর এক ফন্দী করিলেন,—তিনি তাঁর দূত কৃষ্ণাজী ভাস্করকে দিয়া শিবাজীকে খবর পাঠাইলেন,—তোমার বাপ আমার অনেকদিনের দোস্ত, কাজেই তুমি আমার ছেলের মতো। একবার এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলে আমি ভারি খুশী হইব; আর যাতে তোমার ভাল হয়, তার ব্যবস্থা করিব। আদিল শা'কে বলিয়া তোমাকে কোঁকন-রাজ্যে বসাইব। যে-সব কেল্লা এখন তোমার দখলে আছে, পরেও যাহাতে সেগুলি তোমারই থাকে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিব।

আবার আমাদের রাজসরকার হইতে যাহাতে তুমি রাজ-সম্মান, আর অস্ত্রশস্ত্র পাও, তাও করিব। তুমি যদি রাজ-দরবারে হাজির থাকিতে চাও, —ভালই, সেখানে তোমার আদর-যত্নের ত্রুটি হইবে না; আর যদি তাহাতে অমত হয়, ক্ষতি নাই;—যাহাতে না গিয়াই কাজ হয়, তাহাও আমি করিয়া দিব। শুধু একবার চোখের দেখা দিয়া যাইবে, আর কিছুই তোমাকে করিতে হইবে না।

আফজলের দূত কৃষ্ণাজী ভাস্কর প্রতাপগড়ে শিবাজীর কাছে উপস্থিত। শিবাজী তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইলেন। আফজল তাঁহাকে যে-সব কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা শুনিয়া তিনি আরও অবাক হইলেন। দেখা হইলে আফজল বড় খুশী হইবেন, কোঁকন-রাজ্যের রাজা করিয়া দিবেন—এ-সব কি ছলনার কথা নয়? বেণের কাছে ছুঁচ চুরি!—শিবাজীর মনে খট্‌কা লাগিল। রাত্রে নিরিবিলি কৃষ্ণাজীর সঙ্গে দেখা

করিয়া বলিলেন,—দেখুন, আপনি আমার স্বজাতি হিন্দু, তারপর বামুন, তারপর পুরুতবংশ, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, তার ঠিক ঠিক জবাব আমাকে দিতে হইবে।—খাঁ-সাহেবের মনের ভাব কি? আমার সঙ্গে ভাব করা,—না, আমাকে ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলা?

কৃষ্ণাজী আফজলের নিমক খান, তাঁর দূত, সব কথা খুলিয়া বলিতে পারেন না। তবে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া যাহা বলিলেন, তাহাতে আফজলের চালাকী তাঁহার কাছে চাপা রহিল না। কিন্তু তবু কথাটা আরও ভাল করিয়া জানা দরকার, তা ছাড়া খাঁর সঙ্গে কত সৈন্যসামন্ত আছে, তাহাও না জানিলে নয়। আবার আফজল কৃষ্ণাজীকে দিয়া যে-সব কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহারও জবাব দিতে হইবে। শিবাজী তাই গোপীনাথ পন্থ্ নামে একটি বিশ্বাসী চতুর লোককে শিখাইয়া-পড়াইয়া কৃষ্ণাজীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

গোপীনাথ খাঁ-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন,—আপনার কথা-মতো শিবাজী আপনার সঙ্গে দেখা করিতে রাজি আছেন, তবে আপনাকে দিব্য দিয়া বলিতে হইবে যে, দেখা করিতে আসিলে আপনি তাঁর কোন অনিষ্ট করিবেন না।

খাঁ-সাহেব বলিলেন,—তোবা! তোবা! অমন কথা কি মনে করিতে আছে? তার কোনো ভয় নাই। ভালোর জন্যই আমি তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।

গোপীনাথ তারপর আফজল খাঁর সেনাদের সঙ্গে খুব ভাব করিয়া অনেক কথা জানিয়া লইলেন, আরও যে-সব কথা তাহারা বলিতে চাহিল না, ঘুষ দিলে তাহাও তাহারা পট্‌পট্‌ করিয়া বলিয়া ফেলিল। ইহাও বলিল যে, খাঁর মতলব ভাল নয়। সামনা-সামনি যুদ্ধ করিবারও তাঁর ইচ্ছা নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যুদ্ধ করিয়া শিবাজীর মতো লোককে পাকড়াও করা অসম্ভব; তাই তাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া

কাছে আনিবার চেষ্টা। আসিলেই অমনি খাঁ-সাহেব কঁ্যাক্ করিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিবেন।'

গোপীনাথ ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর কাছে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। শিবাজী রাগে দাঁত কড়মড় করিতে লাগিলেন, আর মনে মনে বলিলেন,—বটে তোমার পেটে এত শয়তানি যে আমারই কোটে আসিয়া, আমাকেই ফাঁদে ফেলিয়া, বুক ফুলাইয়া ঘরে ফিরিতে চাও? শিবাজীকে তুমি এখনও ভাল করিয়া চিনিতে পার নাই—এইবার চিনাইব!

শিবাজী খাঁর সঙ্গে দেখা করিতে রাজি হইলেন।

প্রতাপগড় হইতে বাই—সারা পথটাই বন-জঙ্গলে ভরা; শিবাজীর হুকুমে তখন জঙ্গলের ভিতর দিয়া বন কাটিয়া একটা পথ করা হইল। আর খাঁর লোকজনের যাতে কোনো কষ্ট না হয়, তাই পথের পাশে পাশে জল ও খাবার রাখা হইল। আফজল প্রতাপগড়ের নীচে একটা গ্রামে আসিয়া ছাউনী করিলেন।

ঠিক হইল, পরদিন প্রতাপগড়ের কেল্লার নীচে, একটা পাহাড়ের মাথায় দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ হইবে। যেখানে দেখা হইবে, সেখানে শিবাজী একটা তাঁবু খাটাইলেন। তাঁবুর ভিতরে চমৎকার শামিয়ানা—চারিদিকে কত কি আসবাব-পত্র। বসিবার জায়গাটাকে ঠিক রাজা-রাজড়ার দরবারের মতো করিয়া সাজানো হইল। আর বনপথের দুইদিকের ঝোপে-ঝাড়ে শিবাজী অনেক পাকা সৈন্য লুকাইয়া রাখিলেন।

দরবারে যাইবার সময় হইতেছে। শিবাজী খুব শক্ত লোহার জালের পোষাকে শরীর ঢাকিয়া তার উপর কাপড়ের জামা পরিলেন। মাথায় পরিলেন পাগড়ী, কিন্তু তার নীচে রহিল ইস্পাতের টুপি। বাঁ-হাতের আঙুলে লাগাইলেন— বাঘ-নখ। বাঘ-নখ এক-রকম অস্ত্র। এই অস্ত্র হাতের মুঠার মধ্যে রাখা যায়—কড়া দিয়া আঁটা ইস্পাতের পাঁচটি নখ, বাঘের নখের মতোই ধারালো, আর বাঁকা বাঁকা। কাহারও পেটে বসাইয়া দিতে পারিলে তার নাড়ি-ভুঁড়ি সব টানিয়া বাহির করিতে পারা যায়। পাছে কেহ দেখিতে পায় তাই বাঘ-নখ লুকাইলেন মুঠার মধ্যে; আর ডান হাতে জামার আস্তিনের ভিতরে লুকানো রহিল— একখানি সরু ধারালো ছোরা, নাম তার 'বিছুয়া'। সঙ্গে চলিল—ঢাল-তলোয়ারে সাজিয়া দুইজন খুব হুঁসিয়ার সাহসী বীর। শঠের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে শঠ সাজিয়া, বিপদের জন্য তৈরী হইয়া

যাইতে হয়,—ইহা চতুর শিবাজী বেশ ভাল রকমই জানিতেন, তাই তিনি বেশ সাবধান হইয়া চলিলেন।

প্রতাপগড় হইতে বাহির হইয়া পড়িবেন, এমন সময় যেন এক দেবীমূর্ত্তি তাঁহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শিবাজী তাঁহাকে দেখিয়া গড় করিলেন। ইনি কে, জানো? শিবাজীর মা জীজাবাঈ। তিনি পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—তোমার জয় হোক।

স্বামী দূরদেশে—ভুলিয়াও তাঁর খোঁজখবর লন না; এ সংসারে ছেলের মুখ চাহিয়াই তিনি বাঁচিয়া আছেন; শিবাজী যে তাঁহার নয়নের মণি; তাই বারবার সঙ্গীদের বলিয়া দিলেন,—শিবাকে দেখিও,—তাহার ভার তোমাদের ওপর।

আফজল খাঁ শিবাজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন; সঙ্গে তাঁর বন্দুক-ঘাড়ে এক হাজারের উপর সিপাই। শিবাজীর দূত গোপীনাথ আবার তেমনি সেয়ানা; আপত্তি করিয়া

বলিলেন,—দেখুন খাঁ-সাহেব, কাজটা কিন্তু ভাল হইতেছে না; আপনার নাম শুনিয়াই শিবাজী খুব ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন, তার ওপর এত লোকলস্করের বহর দেখিলে তিনি কিছুতেই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ভরসা করিবেন না। আপনি এক কাজ করুন—তিনিও যেমন দু'জন মাত্র রক্ষী লইয়া আসিতেছেন, আপনিও তেমনি দু'জন রক্ষী লইয়া চলুন।

আফজল ভাবিলেন, 'কথাটা মন্দ নয়; তিনি তখনই সৈন্যদের ছাড়িয়া দিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। সঙ্গে রহিল মোটে তিনটি লোক, আর দুই দলের দুই দূত—গোপীনাথ ও কৃষ্ণাজী।

তাঁবুতে পৌঁছিয়া, এদিক-ওদিক চারিদিক চাহিয়া আফজল তো অবাক! মারাঠাটা করিয়াছে কি? একেবারে পূরাদস্তুর নবাবী যে! যেমন দামী গালিচার বাহার, তেমনি তাকিয়ার সাজ, আবার তেমনি আর আর-সব জিনিষপত্রের ঘটা। খাঁ-সাহেবের চোখ টাটাইতে

লাগিল। তিনি রাগ আর কিছুতে চাপিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—সামান্য একটা জায়গীরদার!—তারই ছেলের এত নবাবী! এ কিসের জন্য হে?

শিবাজীর দূত গোপীনাথ ভড়কাইবার লোক নন; তিনি বুদ্ধি করিয়া বলিলেন,—খাঁ-সাহেব, এ সবই আপনার সম্মানের জন্য। আপনি বিজাপুরের মস্ত-বড় সেনাপতি কি না; তাই আপনার মান-রক্ষার জন্য শিবাজী খাইয়া-না-খাইয়া এই-সব আয়োজন করিয়াছেন। দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া গেলেই,—বুঝিলেন কি না খাঁ-সাহেব—মায় তাকিয়া গড়গড়া সব একদম বিজাপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। শিবাজী যে বিজাপুরের কাছে মাথা হেঁট করিয়া তার অধীন হইলেন, এইগুলিই হইবে তার প্রথম নম্বরের নিশানা—রাজার ভেট আর কি!

কথা শুনিয়া খাঁ-সাহেব একেবারে ঠাণ্ডা!

শিবাজী তখন পাহাড়ের নীচে। খাঁ-সাহেবের আসিবার খবর পাইয়া ধীরে-সুস্থে উপরে উঠিতে

লাগিলেন। পথে শুনিলেন, খাঁ সৈয়দ বান্দাকে সঙ্গে আনিয়াছেন। সে ভারি লড়াইওয়ালা। তলোয়ারের খেলায় তখন তার খুব নাম। শিবাজী ধরিয়া বসিলেন,—বান্দাকে না সরাইলে তিনি তাঁবুতে ঢুকিবেন না। খাঁ-সাহেব ভাবিলেন, শিবাজী সত্যই ভয় পাইয়াছে। কাজেই বান্দাকে সরাইলেন।

যেখানে দু'জনের মিলন হইবে, কথাবার্ত্তা হইবে, সেখানটা একটু উঁচু করিয়া বেদীর মতো করা হইয়াছে। আফজল আগে আসিয়া সেই বেদীর উপরে আরাম করিয়া বসিলেন। লোক-জনের ভিড় নাই। বেদীর নীচে শুধু দুইদলের দুইজন করিয়া সেনা, আর একজন করিয়া দূত। শিবাজী সিঁড়ি দিয়া বেদীর উপরে উঠিয়া খাঁ-সাহেবকে সেলাম জানাইলেন।

দিব্য ভালমানুষটির মতো সাজগোছ—দেখিলেই মনে হয় যেন বিদ্রোহী দায়ে পড়িয়া শত্রুর হাতে ধরা দিতে আসিয়াছে,—তলে তলে

যে তাহার এত কারসাজি, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিবার জো নাই। শিবাজীর পোশাক-আষাক দেখিয়া খাঁ-সাহেব মনে মনে হাসিলেন। তাঁহার নিজের কোমরে একখানা ছোরা আঁটা; কিন্তু শিবাজীর সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই দেখা যাইতেছে না। খাঁ-সাহেব যেন শিবাজীকে কোল দিবেন, এমনিভাবে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। শিবাজীও কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন। এইবার সত্যসত্যই কোলাকুলি—যাকে বলে, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি—ঠিক তাই আর কি! কিন্তু শিবাজী লোকটা ভারি বেঁটে, মাথা তাঁর খাঁ-সাহেবের গলা পর্য্যন্ত উঠিল—তার উপর আর উঠিল না। খাঁ-সাহেব দেখিলেন, ভারি মজা; যাকে বাগে ফেলিবার জন্য তাঁর এত চেষ্টা, সে একেবারে হাতের মধ্যে। তিনি তাঁহার লোহার মতো শক্ত বুকের উপর শিবাজীকে আনিয়া প্রাণপণ বলে চাপিয়া ধরিলেন। তেমন-তেমন লোক হইলে আর কিছুই করিতে

হইত না,—চাপের চোটেই হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত। কিন্তু শিবাজীর শরীরটাও লোহার ভীমের মতো শক্ত, তাই ইহাতে তিনি কাবু হইলেন না। খাঁ-সাহেব তখন বাঁ-হাত দিয়া তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিলেন, আর ডান হাতে কোমর হইতে ছোরা টানিয়া খুব জোরে বাঁ-পাঁজরে একটা ঘা মারিলেন। শিবাজী আগে হইতেই সাবধান হইয়া লোহার জামা পরিয়া আসিয়াছিলেন; তাই ছোরার ঘায় তাঁহার কিছুই হইল না। কিন্তু টিপুনীর চোটে তাঁহার দম বন্ধ হইবার মতো হইল; তিনি তখন-তখনই কোনো রকমে দম লইয়া বাঁ-হাতের বাঘ-নখ সজোরে খাঁ-সাহেবের পেটে বসাইয়া দিলেন, আর ডান হাতের 'বিছুয়া' ছোরা মারিলেন তাঁহার পাঁজরে।

খুন! খুন! দাগাবাজী! কে কোথায় আছ? কে কোথায় আছ?—বলিয়া চীৎকার করিয়া খাঁ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন, আর শিবাজীও তাঁর হাত হইতে খালাস পাইয়া—মারিলেন এক লাফ!

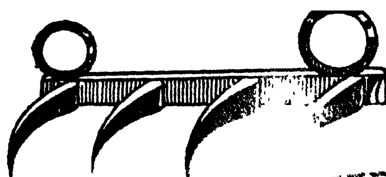
রক্ষীরা চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া আসিল। তলোয়ারওয়ালা বান্দা আর কোনোদিকে না তাকাইয়া, মারিলেন শিবাজীর মাথায় তলোয়ারের এক কোপ! যেমন-তেমন কোপ নয় সে,—যাকে বলে বিরাশী সিক্কা ওজনের, তাই। কোপের চোটে শিবাজীর মাথার পাগড়ীটা কাটিয়া দু'-ফাঁক হইল, আর নীচে যে ইস্পাতের টুপি ছিল, সেটা টোল খাইয়া গেল। শিবাজী বুঝিলেন, গতিক বড় ভাল নয়, তাই ফস্ করিয়া তাঁর রক্ষী জীব মহালার হাত হইতে তলোয়ার লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সামনা-সামনি দুই বীরে বন্ বন্ শব্দে তলোয়ার ঘুরাইয়া লড়াই! জীব মহালার কাছে আর একখানা তলোয়ার ছিল; সেও তখনই ছুটিয়া আসিয়া তলোয়ার চালাইল, আর কচ্ করিয়া বান্দার ডান হাতখানা কাটিয়া ফেলিয়া তাহাকে কাত করিল।

এদিকে বেহারারা আধ-মরা খাঁকে পাল্কীতে তুলিয়া লইয়া পলাইবার চেষ্টায় ছিল। শিবাজীর

একজন মারাঠা-রক্ষী আসিয়া তাহাদের পায়ে তলোয়ারের কোপ মারিল—বেহারারা পাল্কী ফেলিয়া দিল ছুট! রক্ষী তখন খাঁর মাথাটা কাটিয়া প্রভুকে উপহার দিল।

এইরূপে বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া শিবাজী ও তাঁর দু'জন রক্ষী তাড়াতাড়ি প্রতাপগড় কেল্লায় গিয়া কামান দাগিলেন। পাহাড় হইতে পাহাড়ে, বন হইতে বনে, সেই আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠিল। আর যাবে কোথা, প্রভুর এই ইসারা বুঝিয়া যে-সব মারাঠা-সেনা বন-জঙ্গলে লুকাইয়াছিল, তাহারা 'হর হর মহাদেও!' শব্দে বাহির হইয়া পঙ্গপালের মতো আচম্‌কা খাঁর সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল, আর তাহাদের কাটিয়া কুচিকুচি করিতে লাগিল। অনেকেই মরিল, তবে যাহারা দাঁতে তৃণ ধরিয়া মাপ চাহিল, তাহাদিগকে আর কিছু বলা হইল না। শুনা যায়, মোটের উপর মারাঠাদের তলোয়ারের মুখে খাঁ-সাহেবের তিন হাজার সৈন্য সাবাড়

হয়। আর বিজাপুরীদের গোলা-বারুদ, হাতী, ঘোড়া, উট, বস্তাবস্তা কাপড়, আর নগদ ও মণিমাণিক্যে দশ লাখ টাকা—সবই মারাঠাদের হাতে পড়িল। একে তো শিবাজী দিনদিন নিজের বল বাড়াইতেছিলেন, তার উপর এই সব জিনিষপত্র পাইয়া তিনি একেবারে ফাঁপিয়া উঠিলেন। শিবাজীর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।



কেমন জব্দ

ঐ যে বলে, একটা কলাপাতায় দশজন ফকিরের বেশ জায়গা হয়, কিন্তু বড় একটা দেশে দু'জন রাজার জায়গা হয় না,—কথাটা খুব ঠিক। দিল্লীর বাদশা আওরংজীব ও মারাঠাদের রাজা শিবাজী একই সময়ের লোক। দু'জনেই যেমন চতুর, তেমনি বীর। আবার তাঁহাদের চেহারার মধ্যেও খুব মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই মহাবীর, আর এই দুই মহাচতুরের মধ্যে মোটেই ভাব ছিল না,—একজন আর একজনকে জব্দ করিতে পারিলে আর কিছু চাহিতেন না। কাজেই দু'জনের তলোয়ারের খেলা, আর বুদ্ধির খেলা খুব জমিয়া উঠিয়াছিল।

দিল্লীর বাদশা—মস্ত-বড় বাদশা, তাঁর ভারত-জোড়া রাজ্য; কত ধনজন, হাতী-ঘোড়া সৈন্য-সামন্ত তার ঠিক নাই। শিবাজী তখন মারাঠা

দেশের ক্ষুদ্র মালিক। তাঁর ধনজন সৈন্যসামন্ত যতই থাক না, দিল্লীর বাদশার কাছে তাহা কিছুই নয়। সত্যই দু'জনের কথা ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দিল্লীর শাহান্‌শা বাদশা মনে করিলে শিবাজীকে পিঁপড়ার মতো টিপিয়া মারিতে পারিতেন। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে, মারাঠা দেশের এই ক্ষুদ্র রাজা মাঝে মাঝে ডঙ্কা বাজাইয়া বাদশার রাজ্যে ঢুকিতেছেন, আর মার-কাট লুটতরাজ করিয়া অবাধে আপনার গণ্ডীর ভিতরে ফিরিয়া আসিতেছেন। অত-বড় বাদশা, তাঁর অত সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, তবু তিনি শত চেষ্টাতেও শিবাজীর তেমন কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না!

আওরংজীব বাদশার নামে শায়েস্তা খাঁ তখন দক্ষিণাপথ শাসন করিতেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকের দেশগুলিকে দক্ষিণাপথ বলে। শিবাজীর বাড়ীও সেইখানে। তাঁহার তেজ দেখিয়া শায়েস্তা খাঁ আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না; রাগে

আগুন হইয়া সৈন্যসামন্ত লোকলস্কর লইয়া শিবাজীকে জব্দ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। শায়েস্তা খাঁ বড় যে-সে লোক নন,—মস্ত-বড় বীর। আর দেশ-শাসনেও খুব মজবুত। তিনি যে সামান্য জায়গীরদারের ছেলে শিবাজীকে মাথা তুলিতে দিবেন, ইহা কখনও সম্ভব নয়। খাঁ-সাহেব,—আর কথাবার্ত্তা নাই, সসৈন্যে ছুটিয়া গিয়া শিবাজীর বড় সাধের পুণা গ্রামটি কাড়িয়া লইলেন। আর এই গ্রামের যে বাড়ীখানিতে শিবাজী খেলাধূলা করিয়া মানুষ হইয়াছেন, একেবারে সেইখানে গিয়া চাপিয়া বসিলেন। এই বাড়ীর চারিপাশে—তাঁহার শরীর-রক্ষী ও চাকরদিগের থাকিবার জায়গা, আর নক্কারখানার (বাজনার ঘর) বন্দোবস্ত হইল। চারিদিকে তাঁবুর পর তাঁবু! বাদশাহী সেনাদের মধ্যে নাচগান ও আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল! একটু দূরে মোগলদের রাজপুত-সেনাপতি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ দশ হাজার ফৌজ লইয়া পাহারা

দিতে লাগিলেন। শায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে বাহিরে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিলেও, মনে মনে যে ভয় করিতেন, এই-সব কড়াক্কড় ব্যবস্থাই তার সাক্ষী।

সাধের পুণা গ্রামটি শত্রুদের হাতে পড়ায় শিবাজীর মনে ভারি দুঃখ হইল; কিন্তু তাঁহার মতো তেজ আর সাহস, কয়টি লোকের আছে? তিনি এতটুকুও দমিলেন না। মোগলদের জব্দ করিবার জন্য ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন।

তারপর একদিন শিবাজী একেবারে হাজার সৈন্য লইয়া সিংহগড় হইতে বাহির হইলেন। ওখান হইতে পুণা গ্রাম এগার মাইল পথ। সন্ধ্যা হইয়াছে। শিবাজী আঁধারে গা ঢাকিয়া চুপি চুপি গ্রামের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মোগলদের সৈন্যবল অনেক বেশী, সামনা-সামনি লড়াই করিয়া যে তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন। তাই খুব চুপি চুপি গ্রামে চড়াও হইবার ব্যবস্থা।

মোগলদের গণ্ডীর আধ ক্রোশ দূরে পথের দুইদিকে শিবাজী দুইদল মারাঠা-সৈন্য লুকাইয়া রাখিলেন। তারপর চারশো বাছা বাছা সৈন্য লইয়া তিনি যখন গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, তখন অন্ধকার বেশ ঘোর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা মোগলদের এলাকার মধ্যে পা দিতেই শান্ত্রী-পাহারা খুব জোর-গলায় হাঁকিল,—কোন্ হ্যায় ?

শত্রুর পুরীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। চারিদিকে তাহাদের সেনাশান্ত্রী লোকজন কিলকিল্ করিতেছে। টের পাইলে তখনই চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া ছাঁকিয়া ধরিবে, আর তাঁহাদের যে কি দুর্দ্দশা করিবে, ভাবিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। তাহাদেরই লোক জোর-গলায় হাঁকিতেছে,—কোন্ হ্যায় ?

তেমন-তেমন লোক হইলে কথা শুনিয়াই যে তার চোখ কপালে উঠিয়া যাইত, আর তখন-তখনই শত্রুর হাতে ধরা পড়িয়া উপযুক্ত সাজা পাইতে হইত, তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু



শিবাজী মহারাজ

শিবাজী তো যেমন-তেমন লোক নন; তাঁর যেমন উপস্থিত বুদ্ধি, তেমনি সাহস। চট্‌পট্‌ জবাব দিলেন—আমরা তোমাদেরই লোক গো,—তোমাদেরই লোক। বাদশার যে-সব দক্ষিণ-দেশের সেনা এইখানে থাকে, আমরা তারাই; সারাদিন পাহারা দিয়া এখন নিজের নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া যাইতেছি।

উত্তর শুনিয়া শান্ত্রী মনে করিল, তা হবেও বা! এখানে তো দক্ষিণ-দেশের সৈন্যের অভাব নাই। সে আর কোনো আপত্তি করিল না। পাহারাওয়ালার চোখে ধূলো দিয়া শিবাজী একটা নিরিবিলি জায়গায় নিজের লোকজন লইয়া জিরাইতে লাগিলেন। যে বাড়ীতে নবাব শায়েস্তা খাঁ ছিলেন, মাঝরাত্রে লোকজনের ভিড় কম হইলে, তাঁহারা চুপি চুপি সেই বাড়ীর দিকে চলিলেন। গ্রামের কোথায় কি আছে, বিশেষ যে বাড়ীতে তিনি ছেলেবেলায় মানুষ, তাহার অলিগলি সব শিবাজীর চোখের সামনে ভাসিতেছে।

তখন রম্‌জান মাস। এই পুণ্যমাসে মুসলমানরা সারাদিন উপোস করিয়া, রাত্রে খানাপিনা করে। নবাবের অন্দরের চাকর-বাকরেরা অনেকেই দিনের উপবাসের পর রাত্রে পেট পূরিয়া খাইয়া মনের সুখে ঘুমাইতেছে। কেবল জনকয়েক রাঁধুনী রাত থাকিতে থাকিতেই উঠিয়াছে; নবাব সূর্য্য উঠিবার আগেই খানা খাইবেন, তাই তারা উনুন ধরাইয়া রান্নাঘরে খাবার তৈরী করিবার আয়োজন করিতেছে। টুঁ শব্দটি করিবার সময় না দিয়া মারাঠারা গিয়া তাদের খুন করিল। বাইরের এই রান্নাঘর, আর ভিতরের মেয়ে-মহল—এই দু'য়ের মাঝখানে একটা দেওয়াল। এই দেওয়ালের গায়ে শিবাজীর আমলে একটা ছোট দরজা ছিল। কিন্তু আমীর-উমারাদের মতো উঁচুদরের মুসলমানদের অন্দরের ভারি আঁটাআঁটি—দেওয়ালে ফাঁক থাকিবারও জো নাই। তাই এখন ইঁটকাদা দিয়া আচ্ছা

করিয়া উহা বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মারাঠারা ঠিক এই জায়গাটায় গর্ত্ত করিবার জন্য ইঁটগুলি আস্তে আস্তে খুলিতে লাগিল। তাহাদের শাবলের আওয়াজ ও আধ-মরা চাকর-বাকরের গোঁ গোঁ শব্দে নবাবের কয়েকজন চাকরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; তাহারা তখনই তাহাদের সন্দেহের কথা প্রভুকে জানাইল। কিন্তু তুচ্ছ কারণে ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য নবাব-সাহেব তো চটিয়াই আগুন। ধমক খাইয়া চাকরেরা যে যার জায়গায় চলিয়া গেল।

দেওয়ালের গর্ত্ত অল্পে অল্পে বড় হইয়া এমন হইল যে, একটা লোক অনায়াসে তাহার মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতে পারে। শিবাজী, আর তাঁহার বিশ্বাসী শরীর-রক্ষী চিম্‌নাজী বাপুজী, খোলা-তলোয়ার হাতে অন্দর-মহলে ঢুকিয়া পড়িলেন। একটি একটি করিয়া দুশো মারাঠা-সৈন্য তাঁহাদের পিছু পিছু চলিল। অন্দরে ঢুকিয়া শিবাজী দেখিলেন, সেটা যেন একটা গোলক-ধাঁধাঁ—পর্দ্দার পর পর্দ্দা, আড়ালের পর

আড়াল। তাহার মধ্যে কি মাথা গলাইবার জো আছে; কাজেই তলোয়ারের ঘায় পর্দাগুলি কাটিয়া ছিঁড়িয়া, পথ করিয়া, শেষে শিবাজী একেবারে খাঁ-সাহেবের শুইবার ঘরে গিয়া হাজির! নবাব তখনও ঘুমে অচেতন। বেগমেরা ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে জাগাইল, কিন্তু নবাব অস্ত্রে হাত দিবার আগেই শিবাজী এক লাফে তাঁহার কাছে আসিয়া একটা তলোয়ারের ঘা মারিলেন। আঘাতটা কিন্তু ঠিক তাঁহার বুকে লাগে নাই, লাগিলে যে কি হইত, তা বলা যায় না। যাই হোক, আঘাতের চোটে তাঁহার হাতের বুড়ো আঙুলটি উড়িয়া গেল। অন্দরের একজন বেগম-সাহেবা কিন্তু এই সময়ে খুব বুদ্ধি আর সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। বেগতিক দেখিয়া তিনি ঘরের আলো নিবাইয়া দিলেন, আর বাঁদীরা এই ফাঁকে শায়েস্তা খাঁকে একটা সুবিধা-মতো জায়গায় সরাইয়া ফেলিল। অন্ধকারে ছুটাছুটি করিতে দু'জন মারাঠা জলের চৌবাচ্ছায় পড়িয়া গেল।

শিবাজীর বাকি দুশো সৈন্য অন্দরের বাইরে ছিল; তাহারা ওদিকে প্রহরীদের উপর লাফাইয়া পড়িল। যারা জাগিয়াছিল বা যারা ঘুমাইতেছিল, মারাঠারা গিয়া তাদের খুন করিতে লাগিল, আর ঠাট্টা করিয়া চেঁচাইতে লাগিল,—তোমরা তো খুব হুঁসিয়ার পাহারাওয়ালা—বুঝি এমনি করেই পাহারা দাও, আর নবাবের নিমক খাও!

কাটাকাটি খুনোখুনি করিতেই তো লড়াই-ওয়ালাদের ফুর্ত্তি। তাঁদের এই ফুর্ত্তিটা আরও পূরা দমে চালাইবার জন্য মারাঠারা আর একটা ভারি মজার কাণ্ড করিল। বাজনার ঘরের কাছে গিয়া বাজন্‌দারদের খুব একচোট ধমক দিয়া কহিল,—বাজা বাজা ব্যাটারা, জল্‌দী বাজা—খাঁ-সাহেবের হুকুম!

খাঁ-সাহেবের নামে তাদের ঘুম তখন চোখ ছাড়িয়া পলাইবার আর পথ পায় না। তারা চটপট্ যে যার ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকড়ার কাছে বসিয়া, দিল তাহাতে কাটি। আর যাবে কোথায়, বাজনার চোটে বাড়ী ফাটিয়া পড়ে আর কি!

বাজনার জোর আওয়াজে সকলের চেঁচামেচি তলাইয়া গেল, আর শত্রুদের ধেই-ধেই নাচ স্থরু হইল। অন্দরেও তখন গোলমাল এত বেশী হইতে লাগিল যে, মোগল-সৈন্যেরা বুঝিল, তাহাদের মনিবকে শত্রুরা তাড়া করিয়াছে। হুঁসিয়ার—দুশমন! দুশমন!—বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহারা সাজসজ্জা করিতে লাগিল।

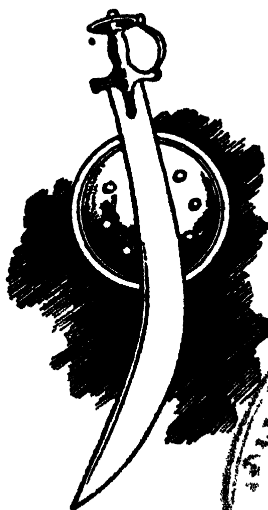
শিবাজী দেখিলেন, মোগলরা জাগিয়া উঠিয়াছে, আর দেরী করা ভাল নয়; তিনি তখন নিজের লোকজন ডাকিয়া সোজাপথে পলাইলেন। এদিকে মোগলরা শত্রুর খোঁজে মিছামিছি এ-তাঁবু সে-তাঁবু ঘুরিয়া হায়রান হইতে লাগিল।

* * *

আওরংজীব বাদশা তখন কাশ্মীর যাইতে-ছিলেন। তিনি স্বপন দেখিতেছিলেন, এতদিনে দক্ষিণাপথ জয় শেষ হইয়াছে,—দুষ্ট শিবাজী জব্দ হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল। পথে যখন শুনিলেন, শায়েস্তা খাঁ লজ্জায়

ও দুঃখে অতি কষ্টে পুণা হইতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, তখন রাগে তাঁহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিতে লাগিল। তিনি হুকুম দিলেন,—আমি আর শায়েস্তা খাঁর মুখও দেখিতে চাই না, নরকের সামিল যে বাঙ্গলা দেশ, তাকে সেই দেশে পাঠাও, —সে সেই দেশেরই উপযুক্ত নবাব!

সেকালের নবাব-বাদশারা বাঙ্গলা দেশকে এমনি ঘৃণা করিতেন!



সেয়ানে সেয়ানে

শিবাজীর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া দেশসুদ্ধ লোকের তাক্ লাগিয়া গেল। এত বড় যে বাঘের মতো বাদশা আওরংজীব—যাঁর নামে বড় বড় রাজা-রাজড়ার মাথা হেঁট হয়, বড় বড় লড়াইওয়ালার বুক ধুক্ ধুক্ করিতে থাকে, তাঁকেও কিছুমাত্র গ্রাহ্য নাই! তাঁরই চোখের উপর আজ এখানে লুটপাট, কাল সেখানে লড়াই! না যায় ধরা, না যায় ঠেকানো! লোকেরা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই মারাঠা মানুষ নয় কখনই—ডানাওয়ালা এক আজব প্রাণী; ডানায় ভর দিয়া উড়িয়া আসে, আবার ডানায় ভর দিয়া যেখানে খুশী উড়িয়া যায়।

বাদশা অবশ্য এ-সকল কথা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তিনি যে সিংহাসনে বেশ আরাম করিয়া বসিয়া দাড়িতে হাত বুলাইবেন, তাহারও উপায় নাই; থাকিয়া থাকিয়া শিবাজীর চালাকীর কথাই মনে

হয়। আর দাঁত কড়মড় করিতে করিতে ভাবেন,—'আপন কোটে পাই তো, চিঁড়ে কুটে খাই।' কিন্তু তাঁকে আপন কোটেও পান না, আর তাঁহার চিঁড়ে কুটিয়াও খাওয়া হয় না। ওদিকে তাহার তেজ যেন দিনদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। শিবাজী যেন আকাশের মারাত্মক বিদ্যুৎ—চকিতে দেখা দিয়া রাজ্যের ভিতর বজ্রের মতো ভাঙ্গিয়া পড়ে, জ্বালাইয়া পোড়াইয়া খাক্ করিয়া নিমেষে হাওয়ায় মিলাইয়া যায়! একদিন সে দশ হাজার সেনার চোখের সামনে অনায়াসে আফজল খাঁর মতো বীরকে খুন করিয়া বাহাদুরী লইল। আর একদিন বিশ হাজার মোগল-ফৌজের মাঝখান দিয়া অন্দরে ঢুকিয়া, শায়েস্তা খাঁর মতো লোককে জখম করিয়া বেমালুম সরিয়া পড়িল! বাদশা রাগে অস্থির হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—কি এতদূর আস্পর্দ্ধা! ঐ ক্ষুদে পাহাড়ে ইঁদুরটা—বাদশা আওরংজীব বাঁচিয়া থাকিতে—যাহা খুশী তাহাই করে! ক্ষুদে জানোয়ারটাকে

ধরিয়া আনিয়া আমার সামনে হাজির করে, এমন লোক কি কেউ নাই ?

শিবাজীর বাড়ী পাহাড়-অঞ্চলে, তাই আওরংজীব বাদশা তাঁর নাম দিয়াছিলেন—পাহাড়ে ইঁদুর। কিন্তু তিনি যাহাই খুশী বলুন না কেন, লোকেরা শিবাজীকে যমের মতো ভয় করিত। সেনাপতি-মশায়রা মাটির দিকে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। অবশেষে গালপাট্টা-দাড়ি রাজপুত-বীর মহারাজা জয়সিংহ বাদশাকে সেলাম জানাইয়া কহিলেন,—জাঁহাপনা, হুকুম করিলে এই রাজপুতই শিবাজীকে জব্দ করিতে পারে।

বাদশা হুকুম দিলেন,—বেশ, বাছা বাছা সৈন্য নিন, আর ভাল ভাল অস্ত্র, পাহাড়ে ইঁদুরের কত বড় দাঁত, আর কতখানি তেজ, তাই আমি দেখতে চাই।

চারিদিকে তখন 'সাজ, সাজ' রব পড়িয়া গেল। পিঁপড়ার সারির মতো যোদ্ধার দল—মোগল-সরকারের বাছা-বাছা লড়াইওয়ালা, দক্ষিণাপথের

দিকে কুচ করিতে করিতে রওনা হইল—একজন সামান্য জায়গীরদারের ছেলেকে জব্দ করিতে!

সেয়ানা সতর্ক বাদশা এই-সকল সৈন্যকে চালাইবার জন্য শুধু এক রাজপুত-সেনাপতি জয়সিংহকে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, —মুসলমান-সেনাপতি দিলীর খাঁকেও পাঠাইয়াছিলেন। বীরত্বে ইঁহারা কেহই কম নন। এই দুই মহাবীর যখন হাজার হাজার সৈন্য লইয়া চারিদিক হইতে মারাঠা-বীরকে চাপিয়া ধরিলেন, তখন তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেমন করিয়া পারিবেন? তাঁহার সৈন্যবল যে মোগল-সৈন্যের কাছে কিছুই নয়। কাজেই তাঁহাকে হার মানিয়া বাদশার সঙ্গে একটা মিটমাট করিতে হইল। তিনি বাদশাকে কতকগুলি কেল্লা, আর কেল্লার এলাকাধীন অনেক জায়গা-জমি, ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন। আর বিজাপুরের রাজাদের সঙ্গে আওরংজীব বাদশার অনেক দিন হইতেই

বিবাদ চলিতেছিল; শিবাজীকে কথা দিতে হইল যে, ইহার পর তিনি বাদশার দলে থাকিয়া বিজাপুরের সঙ্গে লড়িবেন। কিন্তু এদিকে তিনি যাহাই বলুন, আর যাহাই করুন, একটা বিষয়ে ভারি হুঁসিয়ার হইয়া কাজ করিলেন; মিটমাটের সময় স্পষ্টই বলিয়া দিলেন—আমি কিন্তু বাদশার মন্‌সবদার—সেনাপতি-টতি হইতে পারিব না, আমার ওপর যেন তেমন কোনো হুকুম জারি না হয়।

শিবাজীর মতো বীরকে দলে পাইয়া জয়সিংহের খুব সুবিধা হইল। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তোড়ে বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বিজাপুরের কেল্লার কাছে এগোয় কার সাধ্য! বিজাপুরীরা বিপদ বুঝিয়া আগে হইতেই ঘরোয়া বিবাদ মিটাইয়াছে। কাজেই এখন তারা সব একজোট। জয়সিংহকে বেগতিক দেখিয়া শেষে পিছু হটিতে হইল। এই সময়ে আবার বিজাপুরীরা অনেক টাকা ঘুষ দিয়া, নেতাজীকে হাত করিয়া

লইল। তিনি শিবাজীর যুদ্ধের সাথী—মস্ত লড়াইওয়ালা।

জয়সিংহ ভাবনায় পড়িলেন। নেতাজী গেলেন, এইবার তাঁর দেখাদেখি শিবাজীও যদি ফস্ করিয়া গিয়া বিজাপুরের সঙ্গে যোগ দেন, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! জাঁতার ভিতরের গমের মতো, দু'দিকের চাপে পিষিয়া মরিতে হইবে।

শিবাজীকে ঠাঁইনাড়া না করিলে,—এখান হইতে সরাইয়া দিতে না পারিলে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতেছে না। এ সময়টা তাকে একবার ভুলাইয়া-ভালাইয়া আগ্রায় পাঠানো যায় না? কিন্তু শিবাজী যে মিটমাটের সময় আগে থাকিতেই বলিয়া রাখিয়াছেন, 'আমি হুজুরে হাজির হইতে পারিব না।' তা হোক, চতুর জয়সিংহ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই, তিনি এ-সম্বন্ধে সাধ্যমতো চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

জয়সিংহ ফন্দীর কথা বাদশা আওরংজীবকে লিখিলেন। এমন প্রস্তাবে কি তিনি অমত

করিতে পারেন? খুব খুশী হইয়া তাহাতে সায় দিলেন। তখন শিবাজীর মন গলাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কত বন্ধুতা, আর কত লোভের কথাই যে জয়সিংহ তাঁহাকে বলিলেন, তার ঠিক নাই; বলিলেন,—একবার আগ্রায় গিয়া বাদশার অতিথি হওয়ায় ক্ষতি কি? আপনার সঙ্গে তাঁর মিটমাট হইয়া গিয়াছে, এইবার একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইলে, তিনি আপনার উপর ভারি খুশী হইবেন। আপনি আমার কথা শুনুন, আগ্রায় যান, আপনার ভাল হইবে। এই দক্ষিণ-দেশ শাসন করিবার জন্য একজন ভাল লোকের দরকার। আপনি তার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বাদশার সঙ্গে দেখা হইলে, চাই কি, সে পদটাও আপনার চট্ করিয়া জুটিয়া যাইতে পারে।

কথাগুলি যতই মিষ্ট, যতই মোলায়েম হোক না কেন, শিবাজী জয়সিংহকেও চিনিতেন, আর বাদশা আওরংজীবকেও জানিতেন; তাই এ-সম্বন্ধে কি করা উচিত, কি করা অনুচিত, চিন্তা করিতে

লাগিলেন। ধনে জনে যে মোগলের সমান দুনিয়ায় আর কেহ নাই, তারই বাদশা! আর তারই রাজধানী,—দেখিবার মতো জিনিষ বটে! আর তা ছাড়া কয়েকটি কাজের কথাও আছে, বাদশার সঙ্গে দেখা হইলে তার নিষ্পত্তি হইতে পারে। কিন্তু বাদশার কথায় ও কাজে কিছুমাত্র মিল নাই। তাঁকে বিশ্বাস কি? যদি আগ্রায় গিয়া ফাঁদে পড়িতে হয়? শিবাজী চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ্ ভরসা দিয়া বলিলেন,—আপনার কোনো ভয় নাই। আমি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার গায়ে আঁচড়ও লাগিবে না। যান আপনি, একবার মনের সুখে আগ্রা ঘুরিয়া আসুন। আপনার ভালমন্দের দায়ী আমি।

শিবাজীর মন ভিজিল; ভাবিলেন, যখন মিটমাট হইয়াছে, তখন আর কোনো গোল হইবে না— গেলে হয় তো সুবিধাই হইবে। ভয়ের কারণ যে একেবারে নাই, তাহা নহে; কিন্তু সেটা তো অনুমানমাত্র। এই মন-গড়া ভয়ের

জন্য যেখানে ভাল হওয়ার কথাই বেশী, শিবাজীর মতো সাহসী লোক কি সেখানে না গিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই না বীরের আনন্দ? শিবাজী বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়া, বাদশার দরবারের লাভের কথাই তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। না-জানি সেখানে গিয়া কি দেখিবেন! কি হইবে! কি করিবেন! কি আনন্দ! কি আনন্দ!

বড় ছেলে শম্ভুজী, সাতজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, আর চার হাজার সৈন্য সঙ্গে লইয়া শিবাজী আগ্রা চলিলেন। পথ-খরচের জন্য লাখ টাকা বাদশার তরফ হইতে তাঁহাকে দেওয়া হইল।

সেদিন বাদশার জন্মোৎসব। আগ্রা-দুর্গের ভিতরে লাল পাথরে-তৈরী দেওয়ান-ই-আম নামে মস্ত ঘরে দরবার বসিয়াছে। তার কত রকমের কত থাম, থামগুলি কি জমকাল! রেশমী কাপড়, কিংখাপে, মখমলে দেওয়াল আর থামগুলি কি সুন্দরভাবে মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তারপর আবার উৎসবের সাজসজ্জা! সাজের পর সাজ—ফুল, ফুলের মালা, নিশান, আরও কত কি! আসর জমকাইবার জন্য কত যে দামী আসবাবপত্র বাহির হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই। দরবার-ঘরের মেজে খুব দামী রংদার গালিচায় ঢাকা, উপরে কত রঙের চাঁদোয়া। ঘরের সজ্জাও যেমন জমকাল, যেমন সুন্দর,—সভার লোকজনের সাজসজ্জাও তেমনি। তাদের মাথায় রঙবেরঙের পাগড়ী, শালের রেশমের মসলিনের লম্বা লম্বা জামা-পায়জামা, কোমরে বাঁকা তলোয়ার, পায়ে শুঁড়তোলা জরির জুতা!

বাদশার সিংহাসনের সামনে সেই মস্ত-বড় হল, আর তার আশপাশে রাজ্যের সব হোম্‌রা-চোম্‌রা আমীর-উমারা ও তাহাদের লোকজনের বসিবার আসন। লোক—লোকের পরে লোক! যাহারা পদে মানে সকলের উপর, তাহাদের আসন প্রথম, তারপর ছোট-বড়র হিসাব-মতো থাকের পর থাক। জন্মোৎসবে বাদশাকে সোনা-রূপা দিয়া ওজন করা হইয়া থাকে, তাহারও আয়োজন হইয়াছে। বাদশার ওজন হইলে, এই-সব সোনা-রূপা গরীব-দুঃখীদের দান করা হইবে।

শিবাজী রাজধানীর কাছাকাছি পৌঁছিলে বাদশার পক্ষ হইতে জয়সিংহের ছেলে রামসিংহ, আর মুখলিস খাঁ, তাঁহাকে আদর করিয়া লইয়া যাইতে আসিলেন। শিবাজীর মনটা একটু দমিয়া গেল। রামসিংহ, কি মুখলিস, কেহই তেমন উঁচুদরের লোক নন। যাই হোক, যখন আসিয়াছেন, তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখিতেই হইবে। দশজন সৈন্য আর পুত্র শম্ভুজীকে লইয়া শিবাজী

রামসিংহের সঙ্গে দরবারে ঢুকিলেন। নবাব-বাদশার সঙ্গে তো খালি হাতে দেখা করিবার নিয়ম নাই; শিবাজী তাই বাদশার 'নজর' পনর-শো মোহর, আর অন্য বাবদে ছয় হাজার টাকা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। উহা পেশ করা হইলে, বাদশা আওরংজীব শিবাজীকে অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য ডাকিয়া বলিলেন,—আও শিবাজী রাজে!

শিবাজী কাছে গিয়া বাদশাকে দস্তুরমতো তিনবার কুর্নীশ করিলেন। তখন বাদশার হুকুমে তাঁহার আসন ঠিক হইল, সামনের দুই সারির পর তিন নম্বর সারিতে। তারপর বাদশা অন্য কাজে মন দিলেন।

দেশ হইতে আসিবার সময় এই দরবারের সম্বন্ধে কত সুখের কথাই না শিবাজীর মনে উঠিয়াছিল। বাদশার সঙ্গে দেখা হইলে কত বড় খেতাব, কত উপহার, কত বড় রাজ-সম্মান যে তিনি পাইবেন, ভাবিয়াও স্থির করিতে পারেন নাই। তাহার ফল হইল এই! বাদশা একবারমাত্র তাঁহার

নামটি মুখে আনিয়া, তারপর তাঁহার কথা যেন ভুলিয়াই গেলেন !

পর পর দুই সারির পিছনে, তিন নম্বর সারির যে জায়গায় শিবাজীকে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সেখানে কেবল লোকের পরে লোকের আড়াল, তাঁহার উপরে বাদশার একটু নজরও পড়িবার জো নাই। শিবাজীকে ঠায় খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। ইহার পর যখন তিনি শুনিলেন, বাদশার পাঁচ-হাজারী মন্‌সবদার বা সেনাপতিদের মধ্যে তাঁহার আসন হইয়াছে, তখন রাগে তাঁহার গায়ের রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তিনি গলার স্বর চড়াইয়া রামসিংহকে বলিলেন,— কি ! পাঁচ-হাজারীর ভিতরে আমি ! আমার সাত বছরের ছেলে না, পাঁচ-হাজারী—আমার চাকর যে নেতাজী, সেও পাঁচ-হাজারী মন্‌সবদার ! আর আমিও তাই ! এই মান—এই তুচ্ছ পদের জন্যই কি বাদশার হইয়া আমি এত করিয়াছি !—কোন্ দূর মারাঠা-দেশ হইতে এত কষ্ট সহিয়া এতদূর আসিয়াছি !

রাগে অন্ধ শিবাজী নিজের অবস্থা ভুলিয়া, বাদশা আর বাদশাহী-দরবারের আদব-কায়দার কথা ভুলিয়া, যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া জয়সিংহের ছেলে রামসিংহকে বকিতে লাগিলেন। এত অপমানের পর বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরণই ভাল মনে করিয়া, তিনি নিজের গলায় নিজেই তলোয়ার বসাইবার উদ্যোগ করিলেন। রামসিংহের তখন মহাভাবনা। তিনি খুব ব্যস্ত হইয়া শিবাজীকে থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার রাগ কি থামিবার? রাগে, দুঃখে, অপমানে অস্থির শিবাজী সভার মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। দরবারের মধ্যে চেঁচামেচি, তলোয়ারের আস্ফালন, তারপর মূর্চ্ছা! চারিদিকে একটা বিষম হৈচৈ পড়িয়া গেল, সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাদশাও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হইয়াছে?

সত্য কথা খুলিয়া বলিলে বাদশা হয় তো রাগিয়া শিবাজীকে খুব কঠিন শাস্তি দিবেন, রামসিংহ তাই বুদ্ধি করিয়া বলিলেন,—বাঘ হ'ল

বনের জন্তু, দরবারের গরম কি তার সহ্য হয় ?—মেজাজটা একটু বিগড়াইয়াছে।

বুদ্ধিমান বাদশা ব্যাপার বুঝিয়া মনে মনে হাসিলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন,—আচ্ছা, উহাকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাও।

বাসায় ফিরিয়া শিবাজী বাদশাকে মন খুলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে, তাঁর এখন আর মরিবার ভয় নাই। তাঁহাকে মারিয়াই ফেলা হোক ; এ অপমানের চেয়ে মরণই ভাল।

এ-সকল কথা কি গোপন থাকে ? সব কথাই বাদশার কাণে উঠিল। তিনি আরও চটিয়া গেলেন। হুকুম হইল—নজরবন্দী করিয়া রাখ। কোথায় ? শহরের বাইরে একটা বাড়ীতে। পাহাড়ে ইঁদুরকে তো কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, কাছাকাছি রাখিলে কি-জানি কখন কি ঘটাইয়া বসে ! শিবাজী নজরবন্দী হইলেন। তাঁহার খবরদারীর ভার পড়িল, রামসিংহের উপর।

এই রামসিংহ, আর তাঁহার পিতা জয়সিংহের কথায় বিশ্বাস করিয়াই শিবাজী এতদূরে মোগল-দরবারে আসিয়াছিলেন। তাহার এই ফল দেখিয়া পিতাপুত্র দু'জনেই দুঃখিত হইলেন। শিবাজীকে দক্ষিণ-দেশ হইতে কিছুদিনের জন্য সরাইয়া দিবার ইচ্ছাই তাঁহাদের ছিল, আর কোনো মতলব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য তাঁহারা অনেক করিয়া বলিলেন; কিন্তু বাদশার মন এতটুকুও নরম হইল না। তিনি শিবাজীর জন্য আরও কড়া-পাহারার ব্যবস্থা করিলেন। শিবাজীর বাসা-বাড়ীর চারিদিকে কামান, গোলন্দাজ-সেনা, আর অনেক প্রহরী বসানো হইল।

এতদিনে বনের বাঘ খাঁচায় আটক হইল। পাহাড়ে, বনে, ইচ্ছামতো ঘুরিয়া বেড়ানোই ছিল যার আনন্দ, সে এখন নজরবন্দী,—বাড়ী ছাড়িয়া এক পা'ও তাহার নড়িবার উপায় নাই। শিবাজীর মনের ভাব কিরূপ হইল, তাহা তোমরা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ। কিন্তু

তিনি হা-হুতাশ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক নন। কি করিয়া বাদশার হাত হইতে পার পাইবেন,—গণ্ডী কাটিয়া নিজের কোটে যাইবেন, তাহাই হইল তাঁহার চিন্তার বিষয়।

একদিন শিবাজী বাদশাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে ধরিয়া রাখায় তো কোনো লাভ নাই, বরং ছাড়িয়া দিলেই লাভ। ছাড়িয়া দিলে তিনি শুধু বিজাপুর-রাজ্য কেন, গোলকুণ্ডাও তাঁহাকে জয় করিয়া দিবেন।

বাদশা জবাবে বলিলেন,—সবুর, ব্যস্ত কেন, দিনকতক যাক না, তারপর দেখা যাবে।

শিবাজী বুঝিলেন, এ কেবল কথার কথা,—তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিবার ছলমাত্র। দিনকয়েক পরে আবার জানাইলেন,—ভারি একটা গোপন কথা আপনাকে বলিতে চাই। কথাটা আপনার খুব উপকারে আসিবে।

বড়-মন্ত্রী জাফর খাঁ একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলেন,—হুঁসিয়ার হুজুর! অমন কাজও করিবেন না। লোকটা ভেল্কিবাজ, দমবাজ—যতদূর খারাপ হইতে হয়, তাই আর কি! তার সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে গিয়াছেন, কি মরিয়াছেন!

আওরংজীব বাদশাকে এতটা সাবধান না করিলেও চলিত, কেন-না তিনি দুনিয়ায় কাহারও চেয়ে কম হুঁসিয়ার নন। তারপর আফজল খাঁ ও শায়েস্তা খাঁর নাকালের কথা, তখনও তাঁহার মনে জ্বল জ্বল করিতেছে! তিনি শিবাজীর গোপন কথা শুনিলেন না। শিবাজী শেষে মন্ত্রীকেই ধরিয়া দেখিলেন, তাহাতেও কোনো ফল হইল না। তিনি বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলেন। ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আপশোষ করিতে লাগিলেন,—হায় হায়! কি বোকামীর কাজই করিয়াছি, কেন এখানে মরিতে আসিলাম!

ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মাথায় একটা বুদ্ধি জোগাইল। বাদশা, আর তাঁর উজীর-নাজিরকে খোশামোদ না করিয়া তিনি বিছানায় পড়িলেন, —না জানি তাঁহার কতই অসুখ। বিছানা আর ছাড়েন না। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে তাঁহার অসুখের কথা ছড়াইয়া পড়িল। অসুখও কি যেমন-তেমন অসুখ! তা কি সাধু-সজ্জনের 'দোয়া'

না হইলে সারে ? এই দোয়া পাইবার অছিলায় তিনি বামুন-পণ্ডিত, ফকির-সন্ন্যাসী, আর দরবারের আমীর-উমারাদের বড় বড় ঝুড়ি করিয়া সন্দেশ পাঠাইতে লাগিলেন। দু'জন লোক বাঁক বহিয়া, ঝুড়ি ঝুড়ি মিঠাই লইয়া, বিলাইবার জন্য রোজ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার বাসা হইতে বাহির হইয়া যাইত। প্রহরীরা দু'চার দিন ঝুড়ি পরীক্ষা করিল, শেষে আর তাহা দরকার মনে করিল না। বাস্, আর চাই কি! এই তো সুযোগ—এই সুযোগই যে তিনি এতদিন ধরিয়া খুঁজিতেছেন !

একদিন বিকালে শিবাজী প্রহরীদের জানাইলেন, অসুখটা বড্ড বাড়িয়াছে; তাহারা কেহ যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে। হিরাজী ফরজন্দ, শিবাজীর এক বৈমাত্রেয় ভাই। ইঁহাদের দু'জনকেই দেখিতে অনেকটা এক রকম। হিরাজী একটা ভারি মজা করিলেন; শিবাজী যে খাটে শুইতেন, তাহাতে বেশ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন, আর শিবাজীর ডান হাতে যে

সোনার বালা ছিল, সেটা নিজের ডান হাতে পরিয়া, সেই হাতখানা লেপের ভিতর হইতে বাহির করিয়া রাখিলেন।

সেদিন দলে দলে লোক সন্দেশের বাঁক লইয়া বাহির হইতে লাগিল—শিবাজীর যে ভারি অসুখ! অসুখের যেমন বাড়াবাড়ি, মিঠাই বিলাইবার ঘটাও তেমনি,—না হইলে কি রোগ সারে? প্রহরীদেরও তেমনি বুদ্ধি কি না! মিঠাই রোজই যখন এমনি করিয়া যাইতেছে, তখন তার আবার পরীক্ষা কিসের? তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া গোঁফে চাড়া দিয়া, দরজায় পাহারা দিতে লাগিল।

আগে এক বাঁক, পিছনে এক বাঁক, আর মাঝের বাঁকে শিবাজী ও তাঁর ছেলে দু'জনে দু'টি সন্দেশের ঝুড়িতে বসিয়া, সন্দেশ সাজিয়া, মাথায় ঢাকনী চাপা দিলেন। তারপর গোলন্দাজ বরকন্দাজ যে-যেখানে ছিল, সেইখানেই পড়িয়া রহিল, তাহাদিগকে বোকা বানাইয়া তাঁহারা গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইলেন।

মারাঠা-দেশ হইতে শিবাজীর সঙ্গে যে সাতজন কর্ম্মচারী, আর চার হাজার সৈন্য আসিয়াছিল, তাহারা বাদশার হুকুম পাইয়া আগেই দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। হিরাজীর পথ যে সে নিজেই করিয়া লইতে পারিবে, তাহাও শিবাজী ভাল রকমই জানিতেন। কাজেই তিনি নিশ্চিন্ত।

এদিকে হিরাজী সারারাত ও তার পরের দিন দুপুর-বেলা পর্য্যন্ত . বিছানায় দিব্যি শুইয়া কাটাইলেন। সকাল-বেলা প্রহরীরা ঘরে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল, কয়েদী লেপ মুড়ি দিয়া বেশ ঘুমাইতেছে, আর ঘরের মেঝেয় বসিয়া একজন চাকর তাহার পা টিপিতেছে। যে শুইয়া আছে, তার হাতে সেই সোনার বালা। বাস্, আর কি দেখিবে? প্রহরীরা নিশ্চিন্ত হইল; ভাবিল ঐ তো শিবাজী। বেলা যখন প্রায় তিনটা, হিরাজী তখন আস্তে আস্তে চাকরটাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। এতক্ষণে যে শিবাজী ছেলেকে লইয়া

অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন, তার আর সন্দেহ নাই। হিরাজী লোকটা যেমন চালাক, তেমনি মজার; ফটক পার হইতে হইতে শান্ত্রী-পাহারাদের ডাকিয়া বলিলেন,—বহুৎ হুঁসিয়ার! গোল করিও না; শিবাজীর ভারি অসুখ, বুঝলে?

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আর একটু একটু করিয়া প্রহরীদের মনে সন্দেহ হইতে লাগিল,—কয়েদীর ঘরে মানুষের সাড়াশব্দ নাই কেন? আগেকার মতো আর তো লোকজনও শিবাজীকে দেখিতে আসিতেছে না! তাহারা তখন খবর লইতে গেল। ঘরে ঢুকিয়াই তাহাদের চক্ষুস্থির! পাখী যে উড়িয়াছে—শিকলী কাটিয়া! এখন উপায়? বাদশার যে রাগ! তিনি কি তাদের সব-ক'টাকে আস্ত রাখিবেন? প্রহরীরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া গিয়া পুলিসের সর্দ্দার ফুলাদ খাঁকে খবর দিল। খবর শুনিয়া ফুলাদেরও আক্কেল গুড়ুম! কিন্তু শেষটা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সাহসে ভর করিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদের

দোষ কি? পাহারা দিবার কথা, তাহা তো তাহারা সাধ্যমতোই দিয়াছে। তবু যদি শিকার হাত ছাড়িয়া পালায়, তো তাহারা কি করিতে পারে! ফুলাদ বাদশাকে একটা লম্বা সেলাম জানাইয়া কহিল,—খোদাবন্দ্! আমাদের কাহারও কোনো দোষ নাই—দোষ সেই শিবাজীর। সে হয় বেমালুম ডানায় ভর দিয়া উড়িয়াছে, নয় মাটির নীচে ডুব মারিয়াছে। তাহা না হইলে তাহার সাধ্য কি যে পালায়? আমরা যে ঠায় দরজায় দাঁড়াইয়া পাহারা দিয়াছি!

এ-সকল গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাস করিবার লোক বাদশা আওরংজীব নন। তিনি রাগিয়া উঠিয়া, শান্ত্রী-প্রহরীদের উপর মহা তম্বি আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার মুখ হইতে শিবাজীকে ধরিবার হুকুম বাহির হইতে না হইতে, 'ধর ধর' করিতে করিতে লোক ছুটিল! কেউ চলিল ঘোড়ায় চাপিয়া, কেউ চলিল পায়ে হাঁটিয়া। কিন্তু শিবাজী তখন অনেক দূরে। তাঁহাকে ধরিবার জন্য যে

লোক ছুটিবে, তাহা তিনি আগেই জানিতেন। চালাকীতে তো তিনি বাদশার চেয়ে কম নন, বরং কিছু বেশী বলিয়াই বোধ হয়। বাদশার লোকেরা যখন শিবাজীর নাগাল পাইবার জন্য তাঁহার ঘরে ফিরিবার সোজাপথ—পশ্চিমদিকে ছুটিয়াছে, তিনি তখন খাড়া পূব্ দিকে! কেউ চিনিতে না পারে, তাই কখনও সাজিতেছেন ফকির, কখনও সাজিতেছেন সওদাগর!

বাদশা কিন্তু লোক পাঠাইয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই; পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার লোকেরা শিবাজীর নাগাল না পাইলেও, অপর লোকেরা তো পুরস্কারের লোভে তাঁহাকে ধরিয়া দিতে পারে।

পথও যেমন লম্বা, বাধাও তেমনি পায়-পায়, পথও ফুরায় না, আর বাধা কাটিয়াও কাটে না। এমন করিয়া দিন কাটিতেছে। কোনোদিন আহার জোটে, কোনোদিন জোটে না, কিন্তু তবু পা চলিতেছে—ক্রোশের পর ক্রোশ, দিনের পর দিন।

শেষে পা আর চলিতে চায় না, দেহও আর বয় না। শিবাজী দেখিলেন, এক ঘোড়াওয়ালা ঘোড়া লইয়া যাইতেছে—টাট্টু ঘোড়া। অনেকদিন ঘোড়ায় চড়া হয় নাই, পায়েও ব্যথা, তার উপর তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিতে হইবে। শিবাজীর ঘোড়া কিনিবার ভারি ঝোঁক হইল। ঘোড়াওয়ালাকে ডাকিয়া ঘোড়ার দরদস্তুর করিলেন, কিন্তু দাম চুকাইয়া দিতে গিয়া দেখেন, সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছুই নাই—আছে খালি মোহর, হীরাজহরৎ। আচ্ছা, মোহর—মোহরই সই। ঝনাৎ করিয়া গোটাকতক মোহর লোকটার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া, এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিলেন।

লোকটা তো অবাক! একবার চায় মোহরের দিকে, আর, একবার চায় ঘোড়সওয়ারের দিকে। টাকার বদলে মোহর দেয়, এমন লোক তো সে কখন চর্ম্মচক্ষে দেখে নাই। সে একেবারে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল,—'তুমি নিশ্চয়ই শিবাজী—শিবাজী!' শিবাজী তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য মোহরের

থলিটাই ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া, ঘোড়ার পিঠে শপাশপ চাবুক! ঘোড়া বাতাসের আগে ছুটিয়া চলিল।

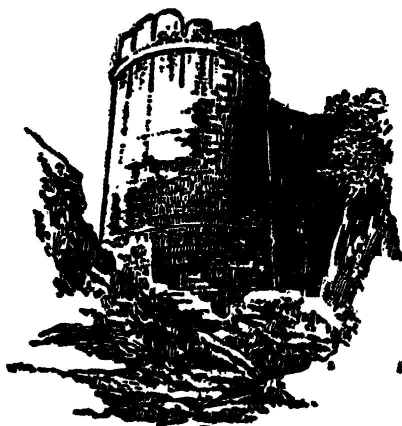
কিন্তু তবু কি ফাঁড়া কাটিতে চায়? ফৌজদার আলী কুলী শিবাজীর পলাইবার খবর পাইয়া, তাঁহাকে ধরিবার জন্য হুঁসিয়ার ছিল। তাহার এলাকায় পা দিতেই, তাহার লোকজনেরা সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু ঠিক শিবাজী কিনা, বুঝিতে পারিল না। রাত যখন দুপুর, শিবাজী চুপি চুপি গিয়া ফৌজদারের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, —ভাবছো কি? আমিই সেই শিবাজী! ধরিয়ে বকশিশ নেবে না কি? তা সে বকশিশ না-হয় আমিই দিচ্ছি। এই নাও না—বলিয়া শিবাজী একরাশ হীরাজহরৎ তাহার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলেন। এত হীরাজহরৎ ফেলিয়া কে আবার মানুষ ধরে!

বাদশার লোকেরাও তাঁহাকে ধরিতে পারিল না, পুরস্কার-ঘোষণারও কোনো ফল হইল না। শিবাজী একদিন সত্যসত্যই 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' দেশে গিয়া মায়ের কাছে

দাঁড়াইলেন। আপনজনেরা, দেশের লোকেরা আনন্দে পাগলের মতো হইয়া উঠিল।

কিন্তু বাদশার ব্যবহারের কথা—তাঁহাকে যে তিনি এতদিন ধরিয়া ভোগাইয়াছেন, তাহার কথা, শিবাজী একদিনের তরেও ভুলিতে পারিলেন না। তাঁর যত শক্তি, যত তেজ, যত বুদ্ধি ছিল, সব এক করিয়া বাদশার পিছনে লাগিলেন। মারাঠা-দেশ এক হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। তারপর—যুদ্ধ আর যুদ্ধ! কামানের ডাক, তলোয়ারের ঝন্‌ঝনা, আর মারাঠাদের জয়ধ্বনিতে দক্ষিণ-দেশটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বাদশার অনেক জায়গা-জমি, অনেক কেল্লা দখল করিয়া, শিবাজী স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইলেন। বাদশা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, মারাঠারা একদিনের তরেও তাঁহাকে শান্তিতে থাকিতে দেয় নাই। তাই মরণকালে তিনি আপশোষ করিয়া বলিলেন,—রাজ্য-শাসন করিতে হইলে সকল সময় সকল কাজ হুঁসিয়ার হইয়া করিতে হয়; এক পলের জন্য বেহুঁস হইলে যে

ক্ষতি, যে অনিষ্ট হয়, সারাজীবনেও আর তাহা শোধরাইবার উপায় থাকে না। আমাদের এতটুকু মনোযোগের অভাবে শিবাজী পলাইল, আর তার জন্য আমাকে সারাজীবন কেবল 'যুদ্ধ যুদ্ধ' করিয়াই হায়রান হইতে হইয়াছে। হায় রে হায়, কি ভুলটাই করিয়াছিলাম!



জয়-পরাজয়

বাদশাকে অবাক করাইয়া, রাজ্যসুদ্ধ লোকের মনে চমক লাগাইয়া দিয়া, অবশেষে একদিন শিবাজী ঘোষণা দিলেন যে, তিনি মারাঠাদের স্বাধীন রাজা, বাদশার কোনো ধার ধারেন না। খুব ঘটা করিয়া তিনি সিংহাসনে বসিলেন, মহা জাঁকজমকে তাঁর অভিষেক হইল।

সাহস বুদ্ধি চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে মানুষ না করিতে পারে, হেন কাজ দুনিয়ায় নাই। এই-সব গুণ তো তাঁহার ছিলই, তা ছাড়া যে-সব গুণ থাকিলে মানুষ সত্যসত্যই মহৎ হয়, সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হয়, সে সব গুণও তাঁহার অল্প ছিল না; তারই একটি গুণের কথা বলিতেছি।

অভিষেকের ব্যাপারে শিবাজীর খরচপত্র হইয়াছিল বিস্তর—প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা। তোষাখানা উজাড় হইয়া গিয়াছিল আর কি।

এই টাকাটা পোষাইয়া লওয়া দরকার, তাই তিনি সদলবলে বাহির হইয়া পড়িলেন—নূতন রাজ্য জয় করিতে। প্রথমেই চড়াও হইলেন মাদ্রাজের কর্ণাটকের উপর; দেশটি ধনধান্যে ভরা—একেবারে সোনার দেশ। শিবাজীর মাব্‌লে-সৈন্য ভারি দুর্দ্দান্ত, ইহাদের লইয়া কর্ণাটক জয় করিতে শিবাজীকে মোটেই বেগ পাইতে হইল না। কাজ হাসিল করিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন। পিছনে তাঁহার অনেক সৈন্য। ফিরিবার মুখে তাহারা বেলবাড়ি গ্রামে ঢুকিয়া বিস্তর রসদ লুটিয়া লইল।

এই বেলবাড়িতে ছিল একটা কেল্লা—সামান্য মাটির কেল্লা। কেল্লাটি একটি স্ত্রীলোকের, নাম তাঁর সাবিত্রী বাঈ। স্ত্রীলোক হইলে কি হইবে, দেশের মানকে তিনি জানের চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন। শিবাজীর লোকদের কাণ্ড দেখিয়া তিনি দলিতা ফণিনীর মতো ফোঁস করিয়া ফণা তুলিয়া

দাঁড়াইলেন।—স্ত্রীলোক বলিয়া বুঝি আমাকে এই অবহেলা! বিনা হুকুমে আমার মুলুকে পা দেওয়া! আবার জোরজুলুম করিয়া আমার লোকদের কাছ থেকে রসদপত্র কাড়িয়া লইয়া বুক ফুলাইয়া যাওয়া! রোসো দেখিয়া লইতেছি, কত-বড় বীর, আর কি-রকম বেটাছেলে তোমরা! —অস্ত্রের ঝনঝনায় দিক কাঁপাইয়া তখনই ঝাঁপাইয়া পড়িলেন মারাঠা-সৈন্যদের মধ্যে, কতকগুলি মাল-বোঝাই গরু লুটিয়া লইয়া তবে তিনি কেল্লায় ফিরিলেন।

খবর যখন শিবাজীর কাণে গেল, তখন তাঁর রাগ দেখে কে! রাগটা যে শুধু সাবিত্রী বাঈয়ের উপরই, তাহা নয়—নিজের লোকজনের উপরও খুব হইল, তিনি তাহাদের ধিক্কার দিতে কসুর করিলেন না। কত মহা মহা বীরের শির শিবাজী তলোয়ারের ঘায় উড়াইয়া দিয়াছেন, কত রাজা-বাদশা তাঁকে যমের মতো ডরায়, আর কিনা সামান্য একটি স্ত্রীলোকের

কাছে তাঁহার মাথা হেঁট হইল! প্রতিকার যে না করিলেই নয়! শিবাজী সেনাপতি দাদজী রঘুনাথকে হুকুম দিলেন, বেলবাড়ির কেল্লা যেন মাটির ওপর খাড়া না থাকে—মাটিতে লুটাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।

দাদজী তখনই তোড়জোড় করিয়া ছুটিলেন বেলবাড়ির দিকে। সেখানকার লোকজনেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই তাদের উপর চড়াও হওয়া সহজ হইয়াছিল। দাদজী যাইতেছেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া,—যাইবেন আর তিন তুড়িতে কেল্লা ফতে করিয়া সাবিত্রী বাঈকে জব্দ করিবেন। কিন্তু হানা দিতে গিয়া দেখেন, কেল্লা নয়, যেন যমের দক্ষিণ-দুয়ার, আগাইয়া গেলে কাহাকেও প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে হয় না। সাবিত্রী বাঈয়ের হাতে তীরধনু, পিঠে তূণ, কোমরে অসি—রণরঙ্গিণী বেশ! ইঙ্গিতে তাঁর শত শত বীর শির দিতে প্রস্তুত। দাদজী তিন-চারিবার দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া বহুলোক

খোয়াইলেন। বুঝিলেন, এ বড় বিষম ঠাঁই—মাটির কেল্লা হইলে কি হইবে, পাষাণের চেয়েও অটল; যাহারা ইহাকে আগলাইতেছে, তাহারা নিমকের মান কি করিয়া রাখিতে হয় বিলক্ষণ জানে। দাদজী আর বেশী বল না দেখাইয়া কলেই কাজ হাসিল করিবার মতলব করিলেন—লোকজন দিয়া কেল্লাটি ঘেরাও করিয়া রাখিলেন। ছোট্ট কেল্লায় কতই বা তীরধনু গুলিবারুদ আছে, আর কতই বা খাবারদাবার মজুত! কিছুদিন আটক রাখিতে পারিলে সব জিনিষেরই টানাটানি পড়িবে, দায়ে পড়িয়া রাণী সহজেই ঘাড় হেঁট করিবেন।

কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, তবু তাঁর কাবু হইবার লক্ষণ নাই। এক-একদিন দরজায় ঘা দিয়া দেখেন, যেন ভীমরুলের চাক!—একসঙ্গে শত শত বীর গর্জ্জিয়া অস্ত্রের ঝনঝনা তুলিয়া রুখিয়া আসে! কি খাইয়া ইহারা বাঁচিয়া আছে, কিসের

জোরে ইহারা লড়িতে ভয় খায় না—তিনি ভাবিয়া কিনারা করিতে পারেন না।

শিবাজী আর তাঁর সেনাসামন্তের নিন্দায় দেশ ভরিয়া গেল। সামান্য একজন স্ত্রীলোককে সায়েস্তা করিতে পারে না—বাগে আনিতে হিমসিম খায়! কি করিয়া ইহারা বড় বড় লড়াইওয়ালার সঙ্গে লড়িয়া আসিল, বড় বড় লড়াই ফতে করিল!

দেখিতে দেখিতে মাসখানেক কাটিয়া গেল। দাদজী যে আশায় কেল্লা ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে আশা একেবারে বিফল হইল না—বেলবাড়ির কেল্লায় যে-সবগুলি বারুদ আর খাবারদাবার ছিল, তাহা সত্যসত্যই ফুরাইয়া আসিল। সাবিত্রী বাঈ দেখিলেন, না খাইয়া তিলে তিলে মরার চেয়ে বীরের মতো লড়াই করিয়া মরা অনেক ভাল। তাঁর যে-সব ধনদৌলৎ, দামী দামী গহনা ছিল, একে একে লোকজনদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন, তারপর সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—এস দেশের বীরপুত্র-সব, দেশের মান রাখিবার জন্য—শেষবারের মতো শত্রুর সঙ্গে বল পরীক্ষা করি। যদি মরিতেই হয়, যত পারি শত্রুনিপাত করিয়া মরি।—তৎক্ষণাৎ কেল্লার মধ্যে বিষম সাড়া পড়িয়া গেল। 'জয় রাণীমাইকী জয়'-রবে সবাই আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল।

প্রভাতের রাঙা আলো কেল্লার তোরণ রাঙাইয়া তুলিতে না তুলিতেই অস্ত্রে অস্ত্রে হাজার সূর্য্য ঝলকাইয়া রাণী সদলে বিপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দুইপক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু রাণীর সৈন্যসামন্ত নিতান্ত অল্প—মারাঠাদের তুলনায় কিছুই নয়। শুধু বীরত্বের বলে তাহারা কতক্ষণ যুঝিবে? যতক্ষণ দেহে প্রাণ রহিল, বিপক্ষের কাছে তাহারা কিছুতেই হার মানিল না—অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া একে একে ধরায় লুটাইল। সাবিত্রী বাঈকে অসহায় পাইয়া মারাঠারা চারিদিক হইতে তাঁহাকে বেড়িয়া ধরিল—সপ্তরথীতে যেমন অভিমন্যুকে ঘিরিয়াছিল। দিনের আলো তখন নিবিয়া আসিয়াছে—সন্ধ্যার আর বড় বাকি নাই। এতক্ষণ অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে তিনি সমানে সমানে যুঝিয়াছেন, দেহ ক্ষতবিক্ষত, তবু তিনি লড়িতেছেন—মরিয়া হইয়া শত্রুনিপাত করিতেছেন। হঠাৎ বিপক্ষের অস্ত্রের ঘায় তাঁহার ঘোড়া খোঁড়া হইয়া পড়িয়া গেল। সাবিত্রী ভূঁয়ে দাঁড়াইয়াই

অস্ত্র চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রান্ত বাহু আর কতদিক সামলাইবে? চারিদিক হইতে তাঁহার উপর অস্ত্র পড়িতেছে। যন্ত্রণায় রণশ্রমে শরীর এলাইয়া পড়িল, তিনি মারাঠাদের হাতে বন্দী হইলেন—তাহাদের উল্লাস-চীৎকারে আকাশ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

সাবিত্রী বাঈ বন্দী হইয়াও পার পাইলেন না। মারাঠাদের মনের ঝাল তখনও মেটে নাই; সেনাদের মধ্যে সখুজী গাইকোয়াড় নামে শিবাজীর একজন আত্মীয় মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া তাঁহাকে গালাগালি করিল, আরও নানা রকমে অপমান করিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিল।

সাবিত্রী বাঈকে তারপর কোলাপুরে শিবাজী মহারাজের কাছে হাজির করা হইল। লোকজন সহায়-সম্পদ যাহা ছিল সব গিয়াছে, তাহার উপর অপমান নির্যাতন! মনের তাপে সাবিত্রী জ্বলিয়া মরিতেছেন। শিবাজীকে দেখামাত্র তিনি সিংহীর মতো গর্জ্জিয়া উঠিলেন—যদি সত্যি-সত্যি

বীর হও, তবে দাও আমার হাতে অস্ত্র, বুঝে নেব—মারাঠাদের রাজা বীর, না তাঁর সেনাসামন্তের মতোই একটা সামান্য দস্যু !

যে-সব সিপাইশান্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল, রাগে তাহারা দাঁত কড়মড় করিতে লাগিল। এই স্ত্রীলোকটি মহারাজের রসদ কাড়িয়া লইয়াছিল, তারপর যুদ্ধ করিয়া কত সৈন্য আর কত অর্থ ক্ষয় করিয়াছে, তাহার উপর এই স্পর্দ্ধা ! কড়া হুকুমের জন্য সবাই শিবাজীর মুখের দিকে চাহিল।

স্নিগ্ধ শান্তস্বরে শিবাজী ডাকিলেন,—মা !

সভার লোকজন হতভম্ব, সাবিত্রী বাঈ অবাক —ডাকের অর্থ কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

শিবাজী তেমনি ঠাণ্ডাভাবে বলিলেন,—আজ থেকে তুমি আমার মা। ছেলের দোষ কি মাকে নিতে আছে ? মন ঠাণ্ডা করে তুমি তোমার নিজের কোটে চলে যাও। বেলবাড়ির কেল্লা তোমার হাতেই রইল।

ক্ষতস্থানে বিষের ছোরাই বসিবে, ইহাই ছিল সাবিত্রী বাঈয়ের বিশ্বাস ; কিন্তু এ যে অমৃতের প্রলেপ ! তাঁর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না।

শিবাজী কড়া-গলায় হাঁকিলেন,—সখুজী !

ব্যাপার দেখিয়া সখুজীর প্রাণ আগেই উড়িয়া গিয়াছিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে শিবাজীর কাছে আসিল !

শিবাজী বলিলেন;—অতি হীন কাপুরুষ তুমি। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। বেলবাড়ির কেল্লাদার পত্নীর গায়ে হাত তুলে তুমি আমার মায়ের অপমান করেছ। আমার সেনাদের মধ্যে তোমার স্থান নেই—কারাগারই তোমার উপযুক্ত স্থান।

শিবাজীর হুকুমে শান্ত্রীরা তখনই সখুজীকে কারাগারে লইয়া চলিল।

মায়ের জাতির সম্মান যে কি করিয়া রাখিতে হয়—দেখিয়া সবাই অবাক হইয়া গেল। সভার

লোকজনেরা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—'জয় শিবাজী মহারাজকী জয়।'

